অর্থনীতির যতকথা

সিন্ডিকেটের ভূত বনাম বাজার অর্থনীতির সঞ্চালন: দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধির ব্যাখ্যার ভিন্ন প্রেক্ষিত

ড. এ.কে.এনামুল হক

জিনিষপত্রের দাম বেড়েই চলছে। সকলেই সচেতন। উপদেষ্টা খাচ্ছেন হিম সিম। এর আগে বাণিজ্য মন্ত্রীরা একের পর এক লড়েছেন এবং হেরেছেন। পত্র পত্রিকা কিংবা খাবার টেবিলে সকলেই সরব। এমনকি ব্যবসায়ীরাও কম গালমন্দ খাচ্ছেন না। কেউ বলছেন 'সিন্ডিকেট' কেউ বলছেন 'মজুদদারী' আর অমনি সরকারের বিভিন্ন সংস্থা হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। মনে হতে পারে এই বুঝি সমাধান এলো কিন্তু আসছে না। এমতাবস্থায় কি করা যায় বা কি করা উচিত তাই নিয়ে আজকের এই লেখা।

আমরা সকলেই জানি যে, দ্রব্যমুল্য নির্ভর করে বাজারে চাহিদা ও সরবরাহের উপর। এই তথ্য সকলেই জানেন। তাই দাম যখন বাড়ে তখন ভাবা উচিত – কে ঘটাচ্ছে অঘটন। ক্রেতারা না বিক্রেতারা। যেহেতু ক্রেতারা সাধারণত বাজারে একক প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা তাই দোষ বর্তায় বিক্রেতার উপর। নিশ্চয়ই ওরা 'দল' বেধেছে! সিন্ডিকেট করেছে। আমাদেরকে বিপদে ফেলে টুপাইস কামাচ্ছে। আর যায় কোথায়? ওদেরকে ধরিয়ে দিন। ঘটনাটা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য তাকি একবার ভেবে দেখেছেন? মানলাম ভোজ্য তেলের বাজারে গুটিকয়েক বিক্রেতার কারসাজি করে দাম বাড়াতেও পারে কিন্তু চালের বাজার? এখানে তো বিক্রেতার অভাব নেই? এই বাজারেও কি বিশেষ কোন গোষ্ঠী দাম নিয়ন্ত্রণ করছেন? হতেও পারে – এমন ধারণা অমুলক নয়। কারণ কি? কারণ হলো খুচরা বাজারে হাজার হাজার বিক্রেতা থাকলেও পাইকারী বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা হাতে গুণা যায়। তাহলে কি তারাই বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। আবার সবজি বাজার লক্ষ্য করলে দেখবেন কাওরান বাজার থেকে মোহাম্মদপুরে যেতে যেতেই পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে কয়েক গুণ। তাহলে? খুচরা বাজারও কি গুটিকয়েক ব্যবসায়ীর দখলে? এসব প্রশ্নের বিশ্লেষণ না করে বাজার মুল্য নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। অন্তত এই বিষয়টি আজকের দিনে সংশ্লিষ্ট সকলের বিশ্বাস করা উচিত।

আসুন – কিছুটা বিশ্লেষণ দিই। প্রথমত ধরি – সিন্ডিকেট তত্ত্ব। সিন্ডিকেট তত্ত্বের উদ্ভাবকরা বলছেন যে, বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে গুটিকয়েক পাইকারী বিক্রেতা বা অনেক সময় বলা যায় কিছু আমদানিকারক। এই সকল আমদানি কারক আগে ভাগেই চাহিদা অনুমান করে এমন ভাবে আমদানি করে পণ্য মজুদ করে যে বাজারে একটি কাল্পনিক সংকট তৈরি হয়। ফলে দাম হু হু করে বেড়ে যায়। এই তত্ত্বের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, যে সকল বাজার আমদানি নির্ভর এবং যে সকল পণ্য চোরাকারবারীদের মাধ্যমে দেশে আসছে না সে ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনা রয়েছে। ভোজ্য তেলের ক্ষেত্রে অনেকেই বলছেন যে, ৮–১০জন আমদানিকারক দেশের সিংহভাগ বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে ফলে এই ক্ষেত্রে 'সিন্ডিকেট' থাকতে পারে। অর্থশাস্ত্রের বিচারে যদি বলা হয় কতজন আমাদানিকারক থাকলে বাজার এই ধরণের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকতে পারে? তাহলে উত্তর হবে – তা বলা মুশকিল। শুধু মাত্র স্বল্প সংখ্যক আমদানি কারকের উপস্থিতি বাজারে সিন্ডিকেটের উপস্থিতি প্রমাণ করে না। মাত্র ৪–৫জন বিক্রেতার বাজারেও দ্রব্যমুল্য প্রতিযোগীতার ভিত্তিতে গঠিত হতে পারে। আমাদের দেশে টুথপেস্ট বা কসমেটিকের বাজার লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এই সব বাজারে অতি স্বল্প সংখ্যক বিক্রেতা থাকা সত্ত্বেও বাজারে প্রতিযোগীতা বিদ্যমান। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, যদি বাজারে স্বল্পসংখ্যক বিক্রেতা থাকে **এবং** যদি বাজারে নতুন কোন আমাদানিকারক বা বিক্রেতা অনুপ্রবেশ করতে না পারে তবেই বাজারের নিয়ন্ত্রণ গুটি কয়েক বিক্রেতার দখলে যায় এবং যে সকল পণ্যের সহজ বিকল্প নেই (যেমন ভোজ্য তেল, চাল, ইত্যাদি) সেইসব ক্ষেত্রে বিক্রেতারা 'সিন্ডিকেটে'র মাধ্যমে দাম বাড়াতে পারে।

এই বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাজারে নতুন বিক্রেতার প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত রাখার উপরই বাজারে প্রতিযোগীতা নির্ভর করছে। প্রশ্ন আসে নতুন বিক্রেতা কেন আসছে না? দু'তিন জন মন্ত্রী চাকুরী খোয়ালেন, অথচ বাজারে গেল দু বছরের মধ্যে নতুন বিক্রেতার আবির্ভাব হচ্ছে না কেন? এর উত্তরে কেউ বলবেন দুর্নীতি বা কেউ বলবেন স্বজনপ্রীতি। মন্ত্রীবর্গ নিশ্চয় ছিলেন দুর্নীতি গ্রস্থ তাই তারা বাজারে নতুন প্রতিযোগী তৈরি করতে সচেষ্ট ছিলেন না। আমার মতে – এই চিন্তাটা যদি সত্য হয় তবে গত ছয় মাসে বিষয়টির সুরাহা হতে পারতো। তাই এই বিশ্লেষণের সাথে আমি একমত

নই। বাজারে কিছু বিক্রেতা কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে দাপট দেখাচ্ছেন কারণ নতুন বিক্রেতারা বাজারে আসতে পারছেন না শুধু তাই নয় চেষ্টা করেও সরকার কাউকে ঢুকাতে পারছেন না। কি করে এই অসম্ভব সম্ভব হলো? আমার মতে – বাংলাদেশের বাজার এখন ১৫ কোটি মানুষের বাজার। এই বাজারের পরিসর বিস্তর। এই বাজারে নতুন কোন আমদানি কারকের অনুপ্রবেশ খুব সহজ নয়। ভেবে দেখুন – সাম্প্রতিক কালে বিডিআর এর দেওয়া প্রস্তাবটি কি ছিল? বিডিআর বলছে যে, আগামী রমযান মাসে বাজারে পণ্য সরবরাহ স্থিতিশীল রাখতে তারা পণ্য আমদানি করতে ইচ্ছুক কিন্তু সরকারকে কিছুটা সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে। কি সেই সাহায্য? তাদের মতে সরকারকে বিনাসুদে ঋণ দিতে হবে। লাগবে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য। এর ফলেই সম্ভব হবে বিডিআরএর আমদানি। বিষয়টি ভেবে দেখবার মতন। বাংলাদেশের মত বৃহৎ দেশে ১৫ কোটি ক্রেতার জন্য যদি কেবল রমজানে প্রয়োজনীয় কিছু পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হয় তবে বিডিআর এর মত প্রতিষ্ঠানেরও দরকার ঋণ সাহায্য। কেন? কারণ বাজারের বিস্তার সত্যিই বড়। এই বৃহৎ বাজারে নতুন আমদানিকারক কি করে ঢুকতে পারে? প্রয়োজন অর্থায়ণ। সরকারের উচিত বিষয়টি অনুসন্ধান করা। কেননা আজকের দিনে বেসরকারী ব্যাংকগুলো গুটি কয়েক পরিবারের দখলে এবং এরা অনেকেই আমদানিকারক। তাই তারা নতুন উদ্যোক্তাদের ঋণ দিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করতে নিশ্চয় রাজি নন। তারা কৌশলে বাজারে নতুন আমদানিকারক ঢুকতে বাধা দিতে পারেন। সরকারের দেখা উচিত কেন কোন নতুন আমদানিকারক এই ক্রমবর্ধমান বাজারে অনুপ্রবেশ করতে পারছে না?

অপরদিকে সরকারী ব্যাংকগুলো দীর্ঘদিন যাবত রয়েছে তোপের মুখে। সকলের এক কথা 'ওরা ঋণ দেয় যাতে শোধ না হয় – বন্ধ কর এসব প্রতিষ্ঠান'। এই ধরণের অভিযোগের কারণে সরকারী ব্যাংকগুলোও সাধারণ ভাবে ঋণ দিচ্ছে কেবল অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানকে। নতুনরা তবে কোথায় যাবে?

অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ এবং নতুন আমদানি কারকের অনুপ্রবেশে ঘটিয়েই সরকার পারে এই বাজারে তথাকথিত গুটি কয়েক বিক্রেতার হাত থেকে বাজারকে মুক্ত করতে। সরকারের উচিত বাজার বিষয়ক একটি প্রতিযোগীতা কমিশনকে সকল সময়ে সক্রিয় রাখা এবং সকল সময়ে নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের বাজার কি করে প্রতিযোগিতামুলক রাখা যায় সে বিষয়ে বিশ্লেষণপুর্বক ব্যবস্থা নেয়া।

আমার মতে টিসিবি কিংবা বিডিআর এর প্রচেষ্ঠার সুফল হবার সম্ভাবনা খুবই কম। কি কি কারণে এর সুফল না আসতে পারে তার ব্যাখ্যা দিই। বিডিআর বা টিসিবি যখনই আমদানি কারক হিসেবে বাজারে উপস্থিত হবে তখনই বেসরকারী আমদানিকারক বাজারের একটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ তথ্য থেকে বঞ্চিত হবে। তা হলো – বেসরকারী আমদানিকারকগণ সকল সময়ই আমদানি পর্যবেক্ষণ করে নিজেরা এমনভাবে আমদানি করে যেন পণ্যের দামে বিরূপ প্রভাব না পড়ে। এখন যখন টিসিবি বা বিডিআর আমদানি করতে যাবে তখনই বেসরকারী আমদানিকারক গণ নিজেদের আমদানি কমিয়ে দেবে (যেহেতু তারা আমদানি সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য পাবে না)। ফলে দেখা যাবে যে, যথা সময়ে বাজারে আরও বেশী সংকট হবে। দ্বিতীয়ত, বিডিআর কিংবা টিসিবি পণ্যের আমদানি করবে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ফলে তাদের আমদানি হবে অত্যন্ত সহজ আর সাধারণ আমদানিকারকগণকে পার হতে হবে নানান অফিস। ফলে যদি ধরেও নিই যে সরকারী কর্মকর্তারা ১০০ ভাগ সৎ তবুও দুইদলের আমদানির ক্ষেত্রে দেখা দেবে সময়ের ব্যবধান। সময় বাড়া মানেই খরচ বাড়া। তাই বেসরকারী আমদানিকারকগণ ভাববেন যে, আমরা আমদানি করলে যেহেতু খরচ বেশি পড়বে সেই হেতু আমরা বাজারে প্রতিযোগীতায় টিকতে পারব না। সেক্ষেত্রে এই সকল পন্য (যে গুলো টিসিবি বা বিডিআর আমদানি করবে) হয় আমদানি করবো না অথবা অল্প আমদানি করব। ফলে বাজারে সংকট আরও বাড়তে পারে। তৃতীয়তঃ যেহেতু টিসিবি বা বিডিআর সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সহজে ঋণ লাভ করবে (সুদমুক্ত বা অল্পসুদে) তাই তাদের ক্ষেত্রে আমদানি ব্যয় সাধারণ আমদানিকারকের চেয়ে কম হবে। এমতাবস্থায় সাধারণ আমদানি কারকরা আমদানিতে উৎসাহ কমিয়ে ফেলবে। বিষয়টি ভেবে দেখবার মত। বিগত ৩ বছর যাবত আমরা বাজার ব্যবস্থায় নানাধরণের এক্সপেরিমেন্ট লক্ষ্য করছি ফলে এক সংকট থেকে আরেক সংকটে উপণীত হচ্ছি। বিষয়টি সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর নিশ্চয়ই ভেবে দেখবেন।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ভোজ্য পণ্যের বাজার ব্যবস্থা ক্রমাগত প্রতিযোগীতা হারাচ্ছে। এর মুল কারণ দুটি, এক, নতুন আমদানিকারক বা ব্যবসায়ী এই সব বাজারে ঢুকতে পারছে না। দুই, ব্যাংকগুলো অনভিজ্ঞ কিংবা নতুন ব্যবসায়ীরা ঋণ নিয়ে বাজারে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে না। তিন. বাজার ক্রমাগত বড় হচ্ছে তাই এই বাজারে সরকারী কোন সংস্থার সাহায্যে মুল্য নিয়ন্ত্রণ দুঃসাধ্য হবে।

অন্যদিকে জনসংখ্যা বাড়ছে এবং বাজার ক্রমাগত বড় হচ্ছে তাই আমদানিজাত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রতি বছর নতুন আমদানিকারকের উপস্থিতি যেন থাকে সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। দুঃখজনক সত্য হলো যে, বেসরকারী ব্যাংকগুলো নতুন বা অনভিজ্ঞ আমদানিকারকে সহজে ঋণ দেবে না তাই সরকারের উচিত সরকারী ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে প্রতিটি পণ্যের ক্ষেত্রে নতুন আমদানিকারক তৈরি করা কিংবা নতুন আমদানিকারকদের জন্য (কেবল নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে) বিশেষ তহবিল থেকে ঋণ সাহায্য করা যাতে বাজারে নিয়মিত প্রতিযোগীতা বাড়ে। এর ফলে বাজারে পণ্যের দাম স্থিতিশীল থাকবে।

[লেখক ইস্ট ওয়েস্ট ইউনির্ভাসিটির অর্থনীতির অধ্যাপক ও ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপের সদস্য]